হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১



হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম

সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ভূমিকা
- সামর্থ্যবান মুসলিমদের হজ্জ পালন
- বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হজ্জ
- তাওয়াফ
- ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম

ভূমিকাঃ

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও মৌলিক ইবাদাত। জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরজ। আত্মিক উন্নতি, সামাজিক সম্প্রীতি ও বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব সর্বাধিক। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য-সংহতি গড়তেও হজ্জের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব মুসলিমের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনাও লাভ করা যায় হজ্জের বিশ্ব মহাসম্মেলন থেকে। হজ্জ শুধুমাত্র ইবাদতই নয়, বরং আত্মিক পরিশুদ্ধতার এক অনস্বীকার্য পদ্ধতি। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জের বিনিময় নিশ্চিত জান্নাত। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে:

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

‘কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়’। (সহীহ বোখারী-১৭৭৩)

জিলহজ মাসের নির্দিষ্ট (৮-১০) তারিখে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা কাবাঘর প্রদক্ষিণ, আরাফাত ময়দানের মহাসম্মেলনে যোগদানসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে হজ্জ আদায় করতে হয়। হজ্জ পালনকারীকে এ সময় অশ্লীলতা-পাপাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যৌনমিলন ইত্যাদি পার্থিব কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। আল কুরআনের ভাষায়:

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ

‘হজ্জের জন্য নির্ধারিত মাস আছে। যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করবে, সে স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন, অশ্লীল কাজ ও অযথা ঝগড়া-বিবাদ না করে তোমরা যে সৎকাজ কর আল্লাহ তাআলা তা জানেন, আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করে। তাকওয়াই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ তোমরা আমাকেই ভয় করো।’ (সূরা বাকারা: ১৯৭)

হজ্জ পালনের সময় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হয়। এ সময় হজ্জ পালনকারীরা তাদের অনেক সম্পদ-প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তারা মুণ্ডিত মস্তকে, স্বল্পবসন আর নগ্ন পায়ে সব সময় মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, রূপ-লাবণ্য, ধন-সম্পদের মোহ কোনো কিছুই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। এভাবে এক দিকে একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগি, অন্য দিকে নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর ও নির্মোহ জীবন যাপনের মাধ্যমে হজ্জ পালনকারীদের আত্মা কুপ্রভাব থেকে কলুষমুক্ত ও বিশুদ্ধ হয়। হজ্জের মাধ্যমে যেমন আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তেমনি গুনাহও দূরীভূত হয়। এ বিষয়ে বুখারি শরিফের এক হাদিসে উল্লেখ আছে, ‘পানি যেমন ময়লা-আবর্জনা দূর করে, তেমনি হজ্জ ও গুনাহ দূর করে।

হজ্জ মুসলমানদের জন্য ফরজ বা আবশ্যিক ইবাদত। প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর হজ্জ ফরজ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

‘তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ রয়েছে, রয়েছে মাকামে ইব্রাহিম। যে সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে যারা পথের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম তাদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাবাঘরে হজ্জ পালন করা ফরজ’ (সূরা বাকারা:৯৭)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা: বলেছেন, ‘হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো। (সহীহ মুসলিম-২২৮৮)

সামর্থ্যবান মুসলিমদের হজ্জ পালন

হাদিসের ভাষায়, ‘আল্লাহ তায়ালা যাকে হজ্জ পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন অথচ সে হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সে দোজখের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতিত হবে’ (মিশকাত)। হজ্জ শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর ফরজ করা হয়নি। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের ওপরও হজ্জ আদায়ের বিধান ছিল। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিস সালামকে কাবাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে কাবাঘর সংস্কার করেছেন এবং তারাও হজ্জ পালন করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই

আরবের লোকেরা হজ্জ পালন করত। তাই তো ইতিহাস থেকে জানা যায়, দক্ষিণ আরবের বাদশাহ আবরাহা রাসূলের জন্ম বছরে কাবাঘর ভেঙে ফেলার জন্য বিশাল হাতিবাহিনী নিয়ে এসেছিল। অবশ্য আল্লাহর বিশেষ রহমতে ও কুদরতে কাবাঘর রক্ষা পায় এবং বাদশাহ আবরাহার বিশাল হাতিবাহিনী আবাবিল পাখির পাথর নিক্ষেপে ভূষিত তৃণরূপ হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ- أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ - وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ - تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ -فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

হাদিস ও ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাহেলি যুগের লোকেরা হজ্জ মওসুমে নগ্ন হয়ে কাবাঘর প্রদক্ষিণ করত। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী সা: হজ্জ মওসুমে মক্কায় আগত মানুষদের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। এতে বোঝা যায়, পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলের ওপরও হজ্জ পালনের বিধান ছিল। তাদের স্মৃতি স্মারক ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাও হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য।অধিকন্তু পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধনও হজ্জের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হজ্জ

হজ্জ শুধুই ইবাদতই নয়। বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। হজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত হয়। ভাষা-বর্ণের ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক-জাতীয় পরিচয়ের পার্থক্য ও ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব মুসলিমের

ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত ও সুসংহত হয় পবিত্র হজ্জ উদযাপনে। বিশ্ব মুসলিমের পারস্পরিক দুঃখ-অভাব, অভিযোগ-সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তার সমাধানের সুযোগ হয় পবিত্র হজ্জের বিশ্ব সম্মেলনে।

হজ্জ এমন এক বিশ্ব সম্মেলন। এ সম্মেলনে বিশ্বের সর্বস্তরের মুসলিম অংশগ্রহণ করতে পারেন। জাতিসঙ্ঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট দেশ-জাতির নেতা ও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। কিন্তু হজ্জের সম্মেলনে বিশ্বের সর্বস্তরের মুসলিমের অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত। উঁচু-নিচু, ভাষা-বর্ণ, জাতি-গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সামর্থ্যবান যে কোনো মুসলিমের নিঃশর্তভাবে হজ্জ করার অধিকার ইসলামসম্মত।

হজ্জ এক ধরনের দীর্ঘ সফর বা ভ্রমণ হলেও তা কোনো ভ্রমণবিলাস নয়। বরং এর মধ্যে লুকায়িত আছে মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা-আনুগত্য আর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় এবং দৈহিক কষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা করা হয় পবিত্র হজ্জে । মূলত হজ্জ একটি অনন্য ইবাদত, যাতে সমন্বয় ঘটেছে আর্থিক ত্যাগ ও দৈহিক কসরতের।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সংহতিতেও হজ্জের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের মওসুমে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় বিশেষত সৌদি আরবের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। এ সময় ব্যবসায়ী বিশ্ব মুসলিম নেতারা আলাপ-আলোচনা-চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতে পারেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম নেতারা পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারেন। এতে বিশ্ব মুসলিম নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠতে পারে।

হজ্জের সময় তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত ও সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের শিকার মুসলিম বিশ্বের জন্য হজ্জ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হজ্জ মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং অধিকার আদায়ের সুযোগ করে দেয়। হজ্জ মওসুমে মুসলিম বিশ্বের নেতারা বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মতভেদ নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ ছাড়া হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন থেকে মুসলিম নেতারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আধিপত্যবাদীদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদসহ প্রচারিত অন্যান্য অপবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের করণীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনাও দিতে পারেন তারা।

আরাফাত ময়দানে অবস্থান হজ্জের অন্যতম ফরজ কাজ। তবে এ অবস্থান নিছক অবস্থানই নয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সমবেত বিশ্ব মুসলিমের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বিশ্বনেতাদের দিকনির্দেশনা দেয়া।

মহানবী সা:-এর হজ্জ থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়। তিনি বিদায় হজ্জের সময় আরাফাত ময়দানে উপস্থিত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ের দিকনির্দেশনা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন এবং তার বক্তব্য অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছানোরও নির্দেশ দিয়েছেন। ঐতিহাসিকেরা হজরতের এ ভাষণকে বিদায় হজের ভাষণ নামে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবীর এ ভাষণ রাজনৈতিক পরিভাষায় ‘ম্যাগনাকার্টা’ হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে।

পবিত্র কাবাঘর প্রদক্ষিণ, আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো, জামারায় পাথর নিক্ষেপ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কোরবানি ইত্যাদি হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদত। হজ্জের এসব ইবাদত পারস্পরিক সম্পর্কিত হলেও এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব ঐতিহ্য।

কাবাঘর প্রদক্ষিণ ও পশু কোরবানির মাধ্যমে হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইলের আদর্শ ও ত্যাগের প্রতি প্রকাশিত হয় গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন। জামারায় পাথর নিক্ষেপের সাথে জড়িত আছে শয়তানের প্রতি বালক ইসমাইলের অবজ্ঞার নিদর্শন। আর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোর মধ্যে নিহিত আছে শিশু ছেলে হজরত ইসমাইলের প্রতি বিবি হাজেরার ব্যাকুলতা স্মরণ।

প্রকৃতপক্ষে হজ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী অনন্য ফরজ ইবাদত ও বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন। হজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের আধ্যাত্মিক-নৈতিক উন্নতি, সামাজিক-রাজনৈতিক সংহতি, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ইসলাম-মুসলিমের অবস্থান সুসংহত ও সুদৃঢ় হয়।

তাওয়াফ

বাইতুল্লাহ নির্মাণের পর আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন মানুষকে হজ্জের আহ্বান করার জন্য। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে হজ্জের জন্য আহ্বান করেন। তাঁর সে আহ্বানটি ছিল এমন-

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

‘এবং মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে

(সাওয়ার হয়ে), তারা আসবে দূর-দূরান্ত থেকে বহু পথ অতিক্রম করে।' (সূরা হজ্জ: ২৭)

মহান আল্লাহর কুদরতের এক অনন্য নিদর্শন এই যে, তিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহি সালামের মুখের সে আহ্বান মক্কার পাহাড় চূড়া থেকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাইতো সে সময় থেকে মুসলিম উম্মাহ 'লাব্বায়িক' ধ্বনিতে মুখরিত করে দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় হাজির হতে শুরু করে।

হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র ৫ দিনে সম্পাদন হয়ে যায়। কিন্তু এ হজ্জের এ সফরে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বেশি যে কাজটি করে তা হলো কাবা শরিফকে অন্তর দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখা এবং তাওয়াফ।কেননা কাবা শরিফ দেখা এবং তাওয়াফে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত ও মর্যাদা।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরিফের ওপর প্রতিদিন ১২০টি রহমত নাজিল করেন। তার মধ্যে-- ৬০টি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য।- ৪০টি রহমত নামাজ আদায়কারীদের জন্য।- ২০টি রহমত কাবা শরিফ দর্শণার্থীদের জন্য।

অতএব কাবা শরিফে অবস্থানকালে যত বেশি সম্ভব মন ভরে দেখা এবং তাওয়াফ করা দরকার। যারা কোনো কারণে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে অপারগ তারা অন্তত মন ভরে কাবা শরিফকে দেখে নেবে।

কাবা শরিফ তাওয়াফের ফজিলত প্রসঙ্গে অন্য হাদিসে এসেছে- হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথভাবে সাত চক্করের মাধ্যমে কাবা শরিফ তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে তবে তার একটি ক্রীতদাস আজাদ করার সমান সাওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতিটি কদমে আল্লাহ তার একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং একটি নেকি লিখে দেন। (মুসনাদে আহমদ)

হাদিসের অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে বনি আবদ্ মান্নাফ! এ বাইতুল্লাহ (কাবা শরিফ) তাওয়াফে এবং নামাজ আদায়ে কাউকে বাধা দেবে না। চাই তা দিনে-রাতে যে কোনো সময়েই ইচ্ছা করুক না কেন। (তিরমিজি-৮৬৮)

হজ্জ আনুষ্ঠানিক ৫ দিনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগে ও পরের বেশি বেশি তাওয়াফ, বাইতুল্লাতে নামাজ এবং হৃদয় ভরে কাবা শরিফ দেখার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা জরুরি। তবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ১২০টি রহমত লাভের আশা করা যায়।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ: যে সব কাজ হজ্জ বা উমরাহ অবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে তা হল তিন প্রকার:

(১) এমন কতিপয় কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম।

(২) এমন কতিপয় কাজ যা শুধুমাত্র পুরুষদের প্রতি হারাম।

(৩) এমন কিছু কাজ যা শুধুমাত্র নারীদের প্রতি হারাম।

প্রথমত: এমন সব কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম, তা হলো (সাতটি) :

১. মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছোট করা কিংবা উঠিয়ে ফেলা। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী:

وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না। (সূরা বাকারা-১৯৬)

বিদ্যানগণ শরীরের সমস্ত চুলকে মাথার চুলের উপর ক্বিয়াস করেছেন। তাই ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্য শরীরের কোন চুল দূর করা জায়েয নয়। আর মহান আল্লাহ পাক মাথা মুণ্ডনের ফিদয়া এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে সিয়াম (তিনটি সিয়াম) কিংবা সাদাক্বা (৬ জন মিসকিনকে অর্ধ সা‘ করে খাদ্য প্রদান) বা কুরবানী দ্বারা ফিদয়া দিবে। (সূরা বাকারাহ-১৯৬)

আর প্রিয় নাবী (সা.) স্পষ্ট করেছেন যে, সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিন দিন। আর সাদাক্বার পরিমাণ হচ্ছে তিন সা’ খাদ্য দ্রব্য ছয় মিসকীনের জন্য। প্রত্যেক মিসকীনকে আধা সা’ করে প্রদান করবে। আর কুরবানী হচ্ছে একটি ছাগল, তা এমন বয়সের হবে যা

হাদীর (কুরবানী) ক্ষেত্রে আবশ্যক এবং যেন তা উপরোক্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়। এই ফিদয়াকে ওলামায়ে কিরামগণ 'ফিদয়াতুল আযা' (যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার উপায়)। এ নাম উপরোক্ত আয়াতের অংশ থেকে নেয়া হয়েছে:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে ..। (সূরা বাকারাহ-১৯৬)

২. ইহরামের অবস্থায় নখ কাটা বা নখ উঠিয়ে ফেলা। এ বিষয়টিকে ওলামায়ে কিরামগণের প্রসিদ্ধ মতে মাথা মুণ্ডনের উপর ক্বিয়াস করা হয়েছে। (যা সূরাহ্ বাকারার আয়াত নং ১৯৬ তে উল্লেখিত হয়েছে।) হাতের নখ এবং পায়ের নখের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন একটি নখ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে কষ্ট অনুভব হয় তাহলে কষ্টদায়ক অংশটুকু কেটে ফেলে দিলে কোন অসুবিধা নেই এবং তাতে কোন ফিদয়াও লাগবে না।

৩. ইহরাম করার পর ইহরামের কাপড়ে কিংবা শরীরে অথবা এমন কিছুতে যা শরীরের সাথে লেগে তাকে তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস, নাবী (সা.) মুহরিম (ইহরামকারী ব্যক্তি) সম্পর্কে বলেন:

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ

মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পাজামা, বুরনুস (মাথা ঢাকা জামা) পরিধান করবে না এবং এমন কাপড় যাতে জা'ফরান বা ওয়ার্স নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস স্পর্শ করেছে।

আরো নাবী (সা.) আরাফায় অবস্থানকালে যেই মুহরিম সাহাবীকে উঁটে মেরে ফেলেছিল তাঁর সম্পর্কে বলেন: সুগন্ধি তার নিকটে নিয়ে যাবে না। আর এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন: সে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়া (লাব্বায়কা .....) পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ।

অনুরূপ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি নাকে টানা বা আরবী কফীতে (ক্বাহ্ওয়া) জা'ফরান মিশানো, যা কাহ্ওয়ার সাথে বা ঘ্রাণে প্রভাব বিস্তার করে, কিংবা চায়ে গোলাপজল বা এমন কিছু মিশানো যাতে সুগন্ধি হয় জয়েয নয়। তেমনি সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে ইহরামের পূর্বে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তা ইহরাম করার পরে অবশিষ্ট থাকলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির চমক দেখতে পেতাম।

৪. নিজের অথবা অপরের বিবাহ বন্ধন করা। এর দলীল নাবী (সা.)-এর বাণী:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

মুহরিম ব্যক্তি (ইহরাম অবস্থায়) নিজে বিবাহ করবে না, কোন মেয়ের অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহও দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

৫.যৌন কামনার সাথে চুম্বন দেয়া, স্পর্শ করা কিংবা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি

এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থঃ করবে, তার জন্য হাজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাকারাহ-১৯৭)

আর ‘রাফাস’ (স্ত্রী সম্ভোগ)-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্ব কার্যাবলী, যেমন চুম্বন দেয়া, খোঁচা দেয়া, কামভাব নিয়ে রসিকতা করা।

সুতরাং কোন ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্য নিজ স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা বা খোঁচা দেয়া বা রসিকতা করা জায়েয নয়। আর মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য স্বামীকে এ ধরণের সুযোগ দেয়াও জায়েয নয়। এমন কি কামভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দিকে তাকানোও হালাল নয়; কারণ, ইহাও স্পর্শের মতই সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত।

৬. সহবাস করা।

এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী:

(فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة

অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার মনস্থ করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাকারাহ-১৯৭)

আর স্বামী-স্ত্রী মিলন হচ্ছে হাজ্জ ও উমরাহ অবস্থায় সর্বাধিক বড় নিষিদ্ধ কাজ। যার দুটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে তার প্রতি দুটি বিষয় আবশ্যক হবে।

(ক) ফিদয়া (গুনাহ্ হতে মুক্তিপণ) ওয়াজিব হবে। আর তা হলো, এমন একটি উঁট অথবা গরু কুরবানী করা যাতে কুরবানীর পশুর আবশ্যক গুণাবলী যেন বিদ্যমান থাকে। এই কুরবানী যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ মাংস অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

(খ) যেই হাজ্জে সহবাস হয়েছে সে হাজ্জ বিনষ্ট হয়ে যাবে, অতএব তাকে অবিলম্বে আগামি বছর সেই হাজ্জ কাজা করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) মুওয়াত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, উমার, আলী এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে ইহরাম অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে? তাঁরা সকলে বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গিয়ে এবারের বাকী হাজ্জের কাজগুলি সম্পূর্ণ করবে, অতঃপর আগামি বছর হাজ্জ কাজা করবে এবং হাদী (কুরবানী) যবহ করবে।

ইমাম মালিক আরো বলেন যে, আলী (রা.) বলেছেন, আগামি বছর যখন স্বামী-স্ত্রী হজ্জ কাজা করবে তখন তারা যেন একে অপর থেকে পৃথক থাকে। এছাড়া অন্য কোন নিষিদ্ধ কাজের কারণে হজ্জ বিনষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা: সহবাস যদি প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর হয়ে থাকে, অর্থাৎ বড় জামরাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার এবং মাথা মুণ্ডনের পর এবং তাওয়াফ ইফাযার (যিয়ারাহ) পূর্বে হয়, তাহলে তার হাজ্জ শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার প্রতি প্রসিদ্ধ মতে দুটো কাজ আবশ্যক হবে:

(ক) একটি ছাগলের ফিদয়া, যা যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ মাংস অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

(খ) হারামের সীমানা অতিক্রম করে হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরামের নবায়ন করবে এবং সিলাই বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করে ইহরাম অবস্থায় এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযা (যিয়ারাহ) করবে।

৭. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ হল, শিকার করা।

আর শিকারী পশু হচ্ছে এমন স্থলচর প্রাণী যা খাওয়া হালাল কিন্তু তা সাধারণতঃ মানুষের পোষ মানে না। যেমন, হরীণ, খরগোশ এবং পায়রা। ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীর শিকার করা হারাম হওয়ার দলীল মহান আল্লাহর বাণী:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً)المائدة

আর ইহরাম অবস্থায় থাকা পর্যন্ত স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। (সূরা আল মায়েদাহ-৯৬)

আরো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ۔المائدة

ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না। (সূরা আল মায়েদাহ-৯৫)

সুতরাং কোন মুহরিম ব্যক্তির জন্য আয়াতে বর্ণিত শিকারী পশু শিকার করা জায়েয নয়, তা সরাসরি হত্যা করা হোক, অথবা তার হত্যার কারণ হওয়া কিংবা ইশারা-ইংগীতের মাধ্যমে হত্যার জন্য সহায্য-সহযোগিতা করা হোক বা তা হত্যার জন্য নিজ অস্ত্র অপর ব্যক্তিকে প্রদান করাই হোক।

শিকারী পশুর মাংস খাওয়া তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে

প্রথম অবস্থা: কোন শিকারী পশু যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজেই হত্যা করে কিংবা তা হত্যা করায় অংশ নেয় তাহলে উক্ত শিকারী পশুর মাংস মুহরিম ব্যক্তির এবং অন্যদের জন্যও হারাম।

দ্বিতীয় অবস্থা: শিকারী পশু যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মুহরিম ব্যক্তি সাহায্য নিয়ে শিকার করে, যেমন, মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকারী পশুর সন্ধান দেয় কিংবা শিকারকারী ব্যক্তিকে শিকার করার জন্য অস্ত্র প্রদান করে তাহলে উক্ত পশু মুহরিম ব্যক্তি জন্য হারাম তবে অন্যের জন্য হারাম নয়।

তৃতীয় অবস্থা: কোন হালাল ব্যক্তি যদি মুহরিম (ইহ্রামের অবস্থায় থাকা) ব্যক্তির জন্য শিকার করে তাহলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম হবে। কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম হবে না।

নাবী (সা.) বলেছেন:

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

স্থলচর শিকারী পশু-পাখী তোমাদের (মুহরিম ব্যক্তির) জন্য হালাল, তবে তা যেন তোমরা নিজে শিকার না কর বা তোমাদের উদ্দেশ্যে যেন তা শিকার করা না হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

আরো আবূ কাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হালাল অবস্থায় একটি নীল গাভী শিকার করেন তখন তাঁর সাথীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তাঁরা তা হতে খান, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের সংশয় হয়, তখন তাঁরা নাবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে তিনি (সা.) বলেন: কোন (মুহরিম) ব্যক্তি তাকে শিকারী পশু সম্পর্কে ইশারা-ইংগীত করেছিল বা তাকে কোন (মুহরিম) ব্যক্তি ইহা শিকার করার নির্দেশ দিয়েছিল কি? তাঁরা বললেন, না (তা কেউ করেনি)। তিনি (সা.) বললেন: তাহলে তা তোমরা খেয়ে নাও। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আর যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন শিকারী পশুকে হত্যা করে তাহলে তাকে তার বিনিময় দিতে হবে। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী:

وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ المائدة

আর জেনে বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোক ফায়সালা করে দেবে, তা কা'বাতে কুরবানী করার জন্য পাঠাতে হবে। কিংবা তার কাফফারা হলো কয়েকজন মিসকিনকে খাদ্যদান অথবা তদনুরূপ সিয়াম পালন, যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। (সূরা আল মায়েদাহ-৯৬)

সুতরাং কেউ যদি কোন পায়রাকে হত্যা করে তাহলে তার অনুরূপ হচ্ছে ছাগল। সুতরাং সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি আদায় করতে পারবে:

(১) একটি ছাগল যবহ করে পায়রার ফিদয়া স্বরূপ গরীব-দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করে দিবে,

(২) ছাগলের মূল্য ধরে টাকা দিয়ে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' করে প্রদান করবে।

(৩) প্রত্যেক মিসকীনের অন্নদানের বিনিময়ে একটি করে সিয়াম রাখবে।

আর গাছ কাটার বিষয়টি ইহরামের কারণে কোন মুহরিম ব্যক্তির প্রতি হারাম হয় না। কেননা ইহা ইহরাম সংক্রান্ত বিধান নয়। তবে যে ব্যক্তি হারামের সীমানার ভিতরে অবস্থান করবে তার প্রতি গাছ কাটা হারাম, সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় থাক বা নাই থাক। অতএব আরাফায় মুহরিম ও যে মুহরিম নয় উভয় ব্যক্তির জন্য গাছ কাটা জায়েয। কিন্তু মুযদালিফা এবং মিনায় উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্য গাছ কাটা হারাম। কারণ, আরাফা হচ্ছে হারাম সীমানার বাইরে পক্ষান্তরে মুযদালিফা এবং মিনা হচ্ছে হারাম সীমানার ভিতরে।

এ সাতটি নিষিদ্ধ কাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম।

দু'টি বিষয় এমন রয়েছে যা ইহরাম অবস্থায় শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য হারাম। আর তা হলো:

১. মাথা ঢাকা। এর প্রমাণ নাবী (সা.)-এর বাণী ঐ মুহরিম ব্যক্তির বিষয়ে যাকে আরাফায় অবস্থানকালে তার সাওয়ারী উষ্ট্রী মেরে দিয়েছিল:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ

তোমরা তাকে পানি ও কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও ও তাকে তার (ইহরামের) দুটো কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা ঢেকোনা। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সুতরাং কোন পুরুষ ব্যক্তির জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা জায়েয নয়, যা মাথার সাথে লেগে থাকে, যেমন পাগড়ী, বিভিন্ন প্রকারের টুপী ও রুমাল ইত্যাদী। তবে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে লেগে থাকে না তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন ছাতা, গাড়ীর ছাদ ও তাঁবু ইত্যাদী।

এর দলীল উম্মে হুসায়ন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ করেছি। অতঃপর তাঁকে জামরাহ আকাবায় কঙ্কর মারার সময় অতঃপর সাওয়ারীর উপর চেপে ফিরে আসার সময় দেখি। তাঁর সঙ্গে বেলাল (রা.) এবং ওসামা (রা.) ছিলেন। তাঁদের একজন নাবী (সা.)-এর সাওয়ারীর (উষ্ট্রী) রসী ধরে টানছিলেন এবং অপর ব্যক্তি নাবী (সা.)-এর মাথার উপর নিজ কাপড় উঠিয়ে রৌদ্র হতে ছায়া করছিলেন। (সহিহ মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী (সা.)-এর জামরাহ আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাঁকে সূর্যের তাপ থেকে ছায়া করছিলেন। তবে ইহরাম অবস্থায় মাথায় বোঝা উঠানো জায়েয, যদিও তাতে মাথার কিছু অংশ ঢেকে যায়। কারণ, মাথার বোঝা দিয়ে তা ঢাকার উদ্দেশ্য করা হয় না। তেমনি পানিতে ডুব দেয়া জায়েয, যদিও পানিতে মাথা ঢেকে যাচ্ছে।

২. ইহরাম অবস্থায় সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। ইহা বিশেষ করে পুরুষদের জন্য হারাম। আর সেলাইকৃত কাপড়ের অর্থ হল,

এমন কাপড় যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের গঠনে তৈরী করা হয়। তা পুরো শরীরেই থাক, যেমন মাথা ঢাকা জুববা এবং আরবী জুববা, কিংবা শরীরের কিছু অংশেই তা হোক, যেমন পাজামা, প্যান্ট, গেঞ্জী, আণ্ডার প্যান্ট, চামড়ার মোজা, কাপড় মোজা, হাত বা পায়ের মোজা।

এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন উমারের বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন যে, নাবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরণের কাপড় পরিধান করতে পারবে? তিনি উত্তরে বলেন:

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخِفَافَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ

(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুববা পরিধান করবে না। এর এমন কাপড় পরিধান করবে না যাকে ওয়ার্স নামক ঘাসের বা জা'ফরানের সুগন্ধী স্পর্শ করেছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

তবে কোন ব্যক্তির নিকট যদি সেলাই বিহীন কাপড় এবং তা ক্রয় করার পয়সাও না থাকে তাহলে জামা ও পায়জামা পরিধান করতে পারবে। তেমনি যদি স্যান্ডেল এবং তা ক্রয় করার পয়সাও না থাকে তাহলে মোজা পরিধান করতে পারবে। আর এ জন্য তার প্রতি কোন ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে আরাফার খুতবায় বলতে শুনেছি:

কারো যদি (ইহরাম অবস্থায়) সেলাই বিহীন লুঙ্গী না থাকে তাহলে সে যেন পায়জামা পরিধান করে। আর যদি স্যান্ডেল না থাকে তাহলে যেন মোজা পরিধান করে (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

কোন ব্যক্তি যদি জামা পরিধান না করে তা নিজ শরীরে জড়িয়ে নেয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তেমনি যদি জুববা বা আলখাল্লাকে শরীরে পরিধান না করে তাকে চাদররূপে ব্যবহার করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ রিপুকৃত চাদর বা লুঙ্গী পরিধান করলে কোন আপত্তি নেই। তেমনি যদি কোন ব্যক্তি নিজ ইহরামের কাপড়ে সুতা দ্বারা গিরা দেয় বা পিন ব্যবহার করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এই ভাবে যদি কোন ব্যক্তি আঙ্গটি, হাত ঘড়ি, চশমা এবং শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে, কিংবা নিজ কাঁধে মশক বা ব্যাগ ঝুলায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

অনুরূপ কেউ যদি প্রয়োজনে -যেমন খুলে পড়ার আশঙ্কা- নিজ চাদরে গিরা দিয়ে বেঁধে রাখে তাহলে কোন আপত্তি নেই। কারণ, এসব ব্যাপারে রসূল (সা.) হতে কোন বাধা-নিষেধ বর্ণিত নেই। আর যে সব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার অর্থও বহন করে না, (সুতরাং তার উপর কিয়াসও করা যাবে না।)

নাবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরণের পোশাক পরিধান করতে পারবে? তখন উত্তরে নাবী (সা.) বলেন:

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخِفَافَ

(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুববা পরিধান করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

নাবী (সা.) জবাবে এমন কপড়ের কথা বলেন, যা পরিধান করা যাবে না, যা প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত কাপড় ছাড়া সমস্ত রকমের কাপড় মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে। আর নাবী (সা.) মুহরিম ব্যক্তি নিকট জুতো-স্যাণ্ডেল না থাকলে পায়ের রক্ষার জন্য মোজা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। তেমনি চক্ষুর সুরক্ষার

উদ্দেশ্যে চশমা পরিধান করা জায়েয। উপরোক্ত দু'টি নিষিদ্ধ কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য।

পক্ষান্তরে মহিলারা মাথা ঢাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় যে কোন কাপড় পরিধান করবে। তবে তারা অলঙ্কার ও সাজ-সজ্যা প্রকাশ করবে না, হাত মোজা পরিধান করবে না, মুখমণ্ডলের উপর নিকাব (ফাটল বিশিষ্ট পর্দা) পরিধান করবে না এবং সামনে নিকটে কোন অপর পুরুষ না থাকলে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে না। তবে পুরুষ মানুষ সামনে পড়লে মুখমণ্ডল ওড়না লটকিয়ে ঢেকে নিবে। কারণ, অপর পুরুষদের সামনে মহিলাদের চেহারা খোলা জায়েয নয়।

আর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কাপড় দ্বারা কাপড় বদল করা জয়েয যা তাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ নয়।

যদি কোন ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তি উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজের কোন একটি করে ফেলে, যেমন সহবাস, শিকার করা বা অন্য কিছু, তাহলে তার তিনটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: ইহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ ভুলে গিয়ে বা অজ্ঞাতা বশতঃ কিংবা বাধ্য হয়ে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় করে ফেলেছে, তাহলে তার উপর কোন দোষ নেই, কোন গোনাহও হবে না, কোন ফিদয়াও (ক্ষতিপুরণ) লাগবে না এবং হাজ্জ উমরাও বিনষ্ট হবে না। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী:

(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।

(সূরা আল বাকারাহ-২৮৬)

আরো আল্লাহর বাণী:

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب5

আর তোমাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, কিন্তু (ধর্তব্য হল) তোমাদের অন্তরের সংকল্প। আরো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ -النحل

কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (সূরা আন নাহল-১০৬)

যখন ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে কুফরী কাজে বা কথায় বাধ্য করা হয়েছে কুফরীর বিধান উঠে যায় তাহলে এর নিম্নের গোনাহসমূহের জন্য বাধ্য করা হলে তাতে অবশ্যই পাকড়াও হবে না। আর এই দলীলগুলি ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ ও অন্যান্য কাজকেও শামিল। যা প্রমাণ করে যে, অপারগ ব্যক্তির উপর থেকে বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় শিকারের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -المائدة

ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না। আর জেনে বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। (সূরা মায়েদা-৯৬)

এ আয়াতে শিকারের বিনিময় ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর শাস্তি ও জরিমানার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে হত্যার শর্ত যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর জেনে বুঝে শিকার না করা হলে তাতে বিনিময়ও নেই এবং কোন গোনাহও নেই। কিন্তু যখনই মুর্খ ব্যক্তি জানতে পারবে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তির স্মরণ হবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরত হবে এবং বাধ্যতা থাকবে না, তখন দ্রুত নিষিদ্ধ কাজ ছেড়ে দেয়া আবশ্যক হবে। আর যদি ওযর দূর হওয়া সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে তবে সে গোনাহগার হবে এবং তার প্রতি ফিদয়া বা বিনিময় যা শরিয়তে নির্ধারিত হয়েছে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কোন মুহরিম মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে ঘুমে থাকা পর্যন্ত তার কোন গোনাহ নেই। তবে জেগে গেলেই তার প্রতি মাথা থেকে কাপড় সরানো আবশ্যক। ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা নিষেধ জানার পরেও যদি কেউ মাথা ঢেকে রাখে তাহলে সে গোনাহগার হবে এবং তার প্রতি ফিদয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ইহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ করল, কিন্তু তা বৈধকারী কোন ওযরের (অসুবিধা) কারণে; তাহলে তার প্রতি নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে ফিদয়া ওয়াজিব হবে, কিন্তু কোন গোনাহ হবে না। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -البقرة

আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না। তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে সিয়াম (তিনটি রোযা) কিংবা সাদাক্বাহ (ছয় মিসকীনের খাবার) বা কুরবানী দ্বারা ফিদয়া দিবে। (সূরা আল বাকারাহ-১৯৬)

তৃতীয় অবস্থা: ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বিনা কোন শরিয়াতী ওযরে ইহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ করল, তাহলে তার গোনাহগার হওয়ার সাথে-সাথে তার প্রতি ফিদয়াও ওয়াজিব হয়ে যাবে।

Notes: